ষষ্ঠ অধ্যায়

কৃষি ও সেচ

ভূমি সদ্ব্যবহার ঃ ঐতিহাসিক পটভূমি

ক্যাপ্টেন গ্যাসট্রেল ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত জেলার রেভিনিউ সার্ভেয়ার ছিলেন। সে সময়ে জেলার আয়তন ছিল ১৫,৯৫,২৬৫ একর। এর মধ্যে পতিত জমি ছিল ২,১৩,৭৩৯ একর যা হ'ল মোট জমির ১৩.৪ শতাংশ অর্থাৎ পতিত জমির পরিমাণ সীমিতই ছিল। ঝিল এবং জলাভূমির তীরভূমির সবটাও পুরোপুরি অকর্ষিত ছিল না, বছরের কোন না কোন সময়ে কিছু না কিছু চাষ হ'তই। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের অবস্থা সম্পর্কে গ্যাসট্রেল বলেছেন যে তখন গ্রাম ও শহরের বাসভূমি এবং উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমের বন-বাদাড় বাদ দিলে অকৃষি জমি প্রায় ছিলই না, এমনকি গ্রীষ্মে যখন জল শুকিয়ে যেত, নালা ও বিলের তীর এমনকি খাতগুলিও পুরোদমে চাষের কাজে ব্যবহার হ'ত।

১৯০৩-০৪ সালের পাওয়া তথ্য থেকে দেখা যায় যে জেলার আয়তন ছিল ২,১৪৩ বর্গমাইল (দুই হাজার একশ তেতাল্লিশ) যার মধ্যে কৃষিজমি ১,১৬৮ বর্গমাইল এবং কৃষি-যোগ্য পতিত জমি ছিল ৪১৭ বর্গমাইল। সে সময় কৃষিজমির ৩০ শতাংশ ছিল দো-ফসলা। আবার ১৯১১-১২ খ্রীষ্টাব্দে কৃষিজমি ছিল ৯০৬ বর্গমাইল। যা ছিল জেলার আয়তনের প্রায় দুই-পঞ্চমাংশ। একবারের বেশি ফসল হ'ত ৩৩২ বর্গমাইল, অর্থাৎ মোট কৃষিজমির এক তৃতীয়াংশে। অকৃষি জমি ছিল ৩৩৫ বর্গমাইল। ১৯২৪-৩২ খ্রীষ্টাব্দের সেট্‌লমেন্ট প্রতিবেদন থেকে দেখা যায় যে সে সময় কৃষিজমির (হালপতিত জমি সহ) মোট পরিমাণ ছিল কৃষিযোগ্য মোট জমির ৮৭.৮ শতাংশ। মোট কৃষিজমির ৩২.৮৩ শতাংশ জমিতে একবারের বেশি ফসল হ'ত। ১৯৪৪-৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ঈশাক সার্ভে থেকে ঐ বছরের এবং সেট্‌লমেন্ট প্রতিবেদন (১৯২৪-৩২) থেকেও এ সম্পর্কিত তথ্য পাওয়া যায়। সারণী- ৬.১ এ তুলনামূলক চিত্রটি দেখা যাবে।

১৯৪৭-৪৮ খ্রীষ্টাব্দে আরো বেশি জমি চাষের আওতায় আসে। ঐ বছর জেলার মোট স্থলভূমির (জলাজমি ও জলাভূমি বাদ দিয়ে) ৮০ শতাংশ জমিতে ফসল ফলানো হয়েছিল। কিন্তু, স্থলভূমির অন্য ব্যবহার ত্র(মশঃ বাড়তে থাকায় এই শতকরা হার ত্র(মশঃ কমতে দেখা যায়। সারণী- ৬.৪ এ (পৃষ্ঠা-২৬৩) থেকে এই চিত্র পরিষ্কার ভাবে বোঝা যায়।

সারণী- ৬.১

কৃষিজমির শ্রেণীবিভাগ ঃ ঈশাক সার্ভে ও সেট্‌লমেন্ট

(আয়তন হাজার একরে)

কৃষিজমির শ্রেণীবিভাগ	ঈশাক সার্ভে ১৯৪৪-৪৫	সেট্‌লমেন্ট ১৯৩২	পার্থক্য
বাগান	৪৫.৮৬	৪৬.১৯	-০.৩৩
আমন	৪৩৫.২৫	৪২৫.২৫	+৯.৮১
অন্যান্য	৮৯২.৩৭	৪৮৪.০১	+৮.৩৬

সূত্র ডিস্ট্রিক্ট সেন্সাস হ্যান্ডবুক, ১৯৬১

অন্যদিকে দো-ফসলা জমির শতকরা হার ত্র(মশঃ বাড়তে থাকে। এই চিত্র সারণী- ৬.২ তে দেওয়া হ'ল। ১৯২৪ থেকে ৩২ সালের সার্ভে ও সেট্‌লমেন্ট অপারেশনের প্রতিবেদন দেখলে সে সময়ে দো-ফসলা জমির একটি মহকুমা-ভিত্তিক তুলনা মূলক প্রতিবেদন পাওয়া যাবে। এই সময়ের মোট কৃষি জমির ৩২.৪৮ শতাংশ ছিল দো-ফসলা এবং বাকি ৬৭.১৭ শতাংশ ছিল এক-ফসলা।

সারণী- ৬.২

দো-ফসলা জমির বৃদ্ধির হার (১৯৪৭-৪৮থেকে ১৯৫৮-৫৯)
মোট কৃষিজমির শতাংশের হিসাবে

১৯৪৭-৪৮	১৯৫০-৫১	১৯৫৪-৫৫	১৯৫৬-৫৭	১৯৫৮-৫৯
২৮.১৪	৩৯.৮৬	৪০.৩৫	৪৩.১৬	৪১.৪১

সূত্র ডিস্ট্রিক্ট সেন্সাস হ্যান্ডবুক, ১৯৬১

মহকুমার মোট কৃষি জমির শতাংশের হিসাবে মহকুমাগুলিতে দোফসলা জমির পরিমাণ ছিল নিম্নরূপ

সদর (বহরমপুর)	লালবাগ	জঙ্গীপুর	কান্দী
৪৮.১০	৩৮.৯২	২৪.২৯	১২.৭৫

এই পার্থক্যের কারণ হ'ল সদর মহকুমায় আউশ ধানের চাষ হ'ত বেশি(অনুন্নত প্রজাতির ধানের চাষ হ'ত কম। আর কান্দীতে মূলতঃ আমন ধানের চাষ হ'ত, যার চাষের মোট সময়কাল আউশের থেকে বেশী।

১৯৫০-৫১ সালে ধানের চাষ হ'ত প্রায় অর্ধেক কৃষি জমিতে। আট শতাংশে হ'ত পাটের চাষ ও ১৮ শতাংশে হ'ত অন্যান্য শস্যের চাষ। তাছাড়া তিল, সরষে এবং আখের চাষও হ'ত। ১৯৫১-৫২ থেকে ১৯৬০-৬১ পর্যন্ত শস্যভিত্তিক কৃষিজমির ব্যবহারের বিভাগ সারণী- ৬.৩ এ দেওয়া হ'ল।

সারণী- ৬.৩
গু(ত্বপূর্ণ শস্যের চাষ এলাকা
(শতাংশের হিসাবে)

	শস্য	১৯৫১-৫২	১৯৫৬-৫৭	১৯৬০-৬১
১)	ধান চাষ	৫৬.৬০	৪৬.৮৮	৫০.০৬
ক)	আমন	৪৯.৩৮	৩৪.২৭	৩৪.৪৫
খ)	আউশ	১৫.০৫	১২.৩০	১৫.০৬
গ)	বোরো	০.১৭	০.৩১	০.৫৫
২)	গম	৩.৮৯	৫.৯৭	২.১১
৩)	যব	৩.৫৯	৪.৩০	২.০৩
৪)	ছোলা	১৫.৮৩	৭.৯৩	৭.৭৬
৫)	খাদ্য শস্য	তথ্য নেই	১২.৪৩	১৮.৬২
৬)	তিসি	২.২০	৩.৬৭	৩.৩০
৭)	সরষে	২.২০	১.৩৫	১.৬৩
৮)	আখ	০.৮০	১.০৭	১.৩০
৯)	পাট	১৩.৭৪	১০.১৩	৭.৯৫
১০)	ফল	তথ্য নেই	২.১৯	১.৬৬

সূত্র ডিস্ট্রিক্ট সেন্সাস হ্যান্ডবুক, ১৯৬১

জেলাকে ধান চাষের ভিত্তিতেও দুটি অঞ্চলে ভাগ করা যেত। একটি হল রাঢ় অঞ্চল যেখানে আমন ধানের চাষ বেশি(অন্যটি হল বাগড়ী অঞ্চলে যেখানে আউশ ধানের চাষই প্রধান।

সেচের (ে ত্রেও জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে পার্থক্য দেখা যায়। রাঢ় অঞ্চলে সেচের জন্য পুকুরের উপরে নির্ভর করতে হ'ত। অন্যদিকে বাগড়ী অঞ্চলে নদী, খাল ও বিলের জলে সেচ হ'ত। অবশ্য জলের প্রাচুর্য থাকলেও শেষোত্ত(অঞ্চলে বন্যার ভয়াবহতা চাষে (তিসাধন করত। হিন্দু ও পাঠান রাজারা, মুর্শিদাবাদের নবাবেরা, স্থানীয় রাজা ও জমিদারেরা রাঢ় অঞ্চলে পুকুর থেকে সেচের গু(ত্ব বুঝেছিলেন। চাষীদের সুবিধার জন্য সাগরদীঘি, সেখের দীঘি এবং আখড়াইয়ের দীঘির মতো বড় জলাশয় খনন করা হয়েছিল। মুসলিম আমলে সেচের সঙ্গে সঙ্গে সৈন্যদের পানীয় জলের জন্যও বাদশাহী সড়কের ধারে পুকুর খনন করা হ'ত। ১৯৬১ সালের সেন্সাস হাত-বইয়ের তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে যে স্বাধীনতার পর পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালীন ২,১২,০০০ একরেরও বেশি জমি সেচের আওতায় এসেছিল, যার মধ্যে ৭৩ হাজার একর ছিল পুকুর থেকে সেচপ্রাপ্ত ও ৯৮ হাজার একর ছিল খাল থেকে সেচপ্রাপ্ত। ১৯৫৩-৫৪ খ্রীষ্টাব্দের আগে জেলায় কোন সরকারি খাল ছিল না। ময়ূরা(ী নদী পরিকল্পনা ও ফরাক্কা ব্যারেজ প্রকল্পের ফলে জেলায় সেচ খালের বিস্তৃতি আরও বেড়ে গেছে।

আমন ধানের অন্তর্গত কয়েকটি বিশেষ প্রজাতির ধান তাদের স(দানা, স্বাদ, সুগন্ধ প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। এদের অনেকগুলি এখনও চাষ হয়। হাণ্টার-এর 'এ স্ট্যাটিসটিক্যাল অ্যাকাউণ্ট অব্ বেঙ্গল' এর নবম খন্ডে এরকম ৩১ টি প্রজাতির একটি সুন্দর তালিকা আছে। সেটি প্রাসঙ্গিক হবে মনে করে নীচে দেওয়া হ'ল। অনেক সময় নামগুলি থেকেই চালের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে একটি ধারণা গড়ে ওঠে। (১) ঘি কলা, (২) গন্ধে(শ্বরী, (৩) চিড়াশালি, (৪) গন্ধমালতী, (৫) গঙ্গাজল, (৬) দুধরাই, (৭) লঘু, (৮) বেনাফুলি, (৯) বলরাম ভোজ, (১০) রাঁধুনি পাগল, (১১) সুন্দর কলমা, (১২) পর্বত জিরা, (১৩) কৃষ(কালমা, (১৪) ওরা, (১৫) কনকচূড়, (১৬) কুসুমশালি, (১৭) সোনাশালি, (১৮) পরমান্নশালি, (১৯) ডহরনাগরা, (২০) ঝিঙাশালি, (২১) নোনা, (২২) বাঁশফুল, (২৩) মেঘি, (২৪) বনগোটা, (২৫) বাঙ্গী, (২৬) কুঞ্চিল, (২৭) রামশাল, (২৮) জটাগোটা, (২৯) রাইমনি, (৩০) দাদখানি ও (৩১) নেচা কলমা।

এছাড়াও সীতাশাল, ভাসামানিক, কাজলগোরি, মাণিকলতা, কামিনীভোগ প্রভৃতি ভাল প্রজাতির আমন ধান এই জেলায় পাওয়া যেত। একটু মোটা ধরনের আমন প্রজাতির মধ্যে বয়রা, ভোরেলেপা, ডাবরাশাল, কালি ডুবরাজ, বেগরে, মুড়কিমালা প্রভৃতি সুলভ ছিল।

বিলের ধারে জলা জমিতে কিছু কিছু প্রজাতির আমন চাষ হ'ত। এই ধান গাছগুলি জল বাড়ার সাথে সাথে দীর্ঘ হয়ে উঠত। হলদেগিরি, বনভূজা, মুত্ত(াহার, লস, জেমরে প্রভৃতি ছিল এই জাতের আমন।

আউশ ধানের মধ্যে পাথরকুচি, মোহনভোগ, আসাম-আউশ প্রভৃতি প্রজাতির নাম জানা যায়।

চাল থেকে তখন যেসব শুকনো খাদ্য প্রস্তুত হত তারও তালিকা অছে, যা এখনকার সঙ্গে মিলবে। সেগুলি হল—খই, মুড়কি, মুড়ি, চিড়া, চাল ভাজা ও পিঠে। চালের পিঠের মধ্যে পুলি, স(-চাকলি (চালের গুঁড়ো দিয়ে তৈরি (টি) মালপোয়া, রসচিতাই, পাকান, ধাপড়া, ঝালপিঠে প্রসিদ্ধ ছিল।

এখন অবশ্য উচ্চফলনশীল জাতের ধান, চাষের সিংহভাগ দখল করে নিয়েছে। তার মধ্যে আই.আর. ৩৬, ৪০৮৪, শ্বেতীস্বর্ণা, লালস্বর্ণা, পারিজাত, স্বর্ণলঘু জনপ্রিয়।

সারণী- ৬.৪

মোট জমির তুলনায় বিভিন্ন ধরণের জমির অনুপাত

(১৯৪৭-৪৮ থেকে ১৯৫৮-৫৯)

	১৯৪৭-৪৮	১৯৫০-৫১	১৯৫৪-৫৫	১৯৫৬-৫৭	১৯৫৮-৫৯
১) কৃষিকাজে অপ্রাপ্ত জমি	১২.৯৬	১৩.০৯	১৩.৬০	১৩.৮৪	১৪.১৮
২) হাল পতিত ছাড়া অন্যান্য অকৃষি জমি	৩.৬৭	৮.২৬	৭.৭১	৬.৭৮	৬.০২
৩) হাল পতিত	২.৯৯	২.৩২	৩.১৯	৯.০৯	৬.২৪
৪) কর্ষিত জমি	৮০.৩৮	৭৬.৩৪	৭৫.৫০	৭০.২৪	৭৩.৫২

সূত্র ডিস্ট্রিক্ট সেন্সাস হ্যান্ডবুক, ১৯৬১

সারণী- ৬.৫

ভূমি-ব্যবহার (১৮৫৫ থেকে ৪৪-৪৫)

(আয়তন হাজার একরে)

	১৮৫৫	১৯০৩-০৪	১৯১১-১২	১৯৩২	১৯৪৪-৪৫
১) জেলা	১,৫৯৭.২৭	১,৩৭১.৫২	১,৩৭১.১২	—	১,৩৮৮.২৪
২) ক) কৃষি জমি	—	—	৫৭৯.৮৪	—	—
খ) হাল পতিত	—	—	৩৭২.৪৮	—	—
মোট (ক + খ)	—	৭৪৪.৯৬	৯৫২.৩২	—	৯৭৩.৪৯
৩) দো-ফসলা ও বহু ফসলা	—	২২৩.৫০ (প্রায়)	২১২.৪৮	—	—
৪) কৃষিযোগ্য পতিত	—	২৬৬.৮৮	২৬৬.৮৮	১৭১.৮২	১৪১.৪৯
৫) অকৃষি পতিত	—	—	৫৫.২৩	১৮০.০১	১৯৫.৩৫
৬) জলাজমি	—	—	—	—	৭৭.১২
৭) মোট পতিত	২১৩.৭৪	—	—	—	—

সূত্র ডিস্ট্রিক্ট সেন্সাস হ্যান্ডবুক, ১৯৫১

সারণী- ৬.৬
জেলার ভূমি ব্যবহারের তুলনামূলক তথ্য (১৯৬০-৬৫)
(আয়তন হাজার একরে)

	১৯৬০-৬১	১৯৬১-৬২	১৯৬২-৬৩	১৯৬৩-৬৪	১৯৬৪-৬৫
জেলা	১,৩২৬.১	১,৩২৬.১	১,৩২৬.১	১,৩২৬.১	১,৩২৬.১
বনাঞ্চল	১.৬	১.৬	১.৬	১.৬	১.৬
কৃষিবর্জিত জমি	১৮৯.০	১৮৯.০	১৮৯.০	১৮৯.০	১৮৯.০
অন্যান্য অকৃষি জমি-					
হাল পতিত ব্যতিরেকে	৬৩.৯	৬৫.০	৬৮.৯	৬৮.৩	৬৭.৮
হাল পতিত	৫০.১	৫০.১	৪৬.৯	৪৪.৩	৪০.০
কৃষি জমি	১,০২১.৫	১,০১৯.৫	১,০১৯.৬	১,০২২.৯	১,০২৭.৭
দো-ফসলা ও বহু					
ফসলী জমি	৪৪২.৫	৪৫২.১	৪৩৪.৪	৪৪৮.৮	৪৭৭.০
মোট ফসল উৎপাদক জমি	১,৪৬৪.০	১,৪৭১.৬	১,৪৫৪.০	১,৪৭১.৭	১,৫০৪.৭

সূত্র ওয়েস্ট বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারস্, মুর্শিদাবাদ, ১৯৭৯।

বর্তমান পটভূমি

মুর্শিদাবাদ কৃষি প্রধান জেলা। দেশ বিভাজনের আগে থেকেই এই জেলা 'কৃষি প্রধান জেলা' বলে চিহ্নিত হয়ে আছে। পশ্চিমবঙ্গের কৃষি মানচিত্রে এই জেলা একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে, কারণ এই জেলার মাটি ও জলবায়ু বহুরকমের ফসল উৎপাদনের অনুকূল। বহু ধরনের ফসলের চাষ হয় বলে এই জেলাকে 'শস্যের প্রদর্শনশালা'ও বলা হয়ে থাকে। বলা বাহুল্য এই নামকরণে কোনো অত্যুক্তি নেই।

এই জেলার ভৌগোলিক আয়তন ৫,৩২,৫০০ হেক্টর, তার মধ্যে আবাদী জমি ছিল ৩,৫,০০০ হেক্টর। কিন্তু ১৯৮০ সাল থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত, বিশেষ করে নব্বই দশকে পদ্মা নদীর ভাঙনের জন্য প্রায় ১০,০০০—১৫,০০০ হেক্টর জমি নদীগর্ভে চলে গেছে এবং এখনও পর্যন্ত এই ভয়াবহ ভাঙন অব্যাহত আছে। যে সমস্ত ব্লক এই ভাঙনে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, সেগুলি হ'ল—ফরাক্কা, সামশেরগঞ্জ, রঘুনাথগঞ্জ-২ লালগোলা, ভগবানগোলা-২, রাণীনগর-২ এবং জলঙ্গী।

সর্বোপরি ২০,০০০ থেকে ২৫,০০০ হেক্টর জমি প্রায় সারাবছর জলমগ্ন থাকে। এই সব কারণে আবাদী জমির পরিমাণ কমে দাঁড়িয়েছে-৩,৬৫,০০০ হেক্টর। পদ্মানদীর ভাঙনের কারণে জমির বিলুপ্তির পরিমাণ নির্ধারণ করার জন্য চাই সুষ্ঠু জরিপ ব্যবস্থা যার মাধ্যমে জেলার ভৌগোলিক আয়তন এবং পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত আবাদী জমির সঠিক পরিমাণ নির্ধারণ করা সম্ভবপর হবে।

জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান চাপ জেলার অর্থনীতিতে ক্রমাগত আঘাত হানছে। যেহেতু এ জেলা কৃষিপ্রধান জেলা সেইহেতু কৃষিক্ষেত্রে আঘাত বেশী। প্রসঙ্গত বলা যায়, আদমসুমারি অনুযায়ী ২০০১ সালে এই জেলায় মাথাপিছু আবাদী জমির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ০.০৬ হেক্টর (আধ বিঘারও কিছু কম)।

১৯৮০ সাল থেকে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ২০ বৎসর জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান চাপের পাশাপাশি কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদনের ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন হয়েছে। আগামী দিনও উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা বাড়াতে হবে। নচেৎ জেলার কৃষি অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়বে এবং জনসংখ্যাবৃদ্ধির মোকাবিলা করা সম্ভবপর হবে না।

বহুমুখী প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও--অধিক ফলনশীল শংসিত বীজের ব্যবহার, মাটি পরীক্ষার ভিত্তিতে সুষম সারের প্রয়োগ, প্রয়োজনে কীটনাশক ঔষধের ব্যবহার, আধুনিক কৃষি-যন্ত্রপাতির প্রয়োগ, সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণের ফলে একদিকে যেমন চাষের নিবিড়তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২১৭ শতাংশ, তেমনি

এই জেলা তন্ডুলজাতীয় খাদ্য এবং সব্জী উৎপাদনে স্বয়ম্ভর হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে এই জেলায় ২৫ শতাংশ হারে তৈলবীজ ও ডালশস্য উৎপাদনে ঘাটতি রয়েছে। তাছাড়া প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যেমন বন্যা ও খরা, এ জেলার প্রায় নিয়মিত ঘটনা। সেসব কারণেও কৃষিজাত পণ্যের প্রভূত (তি হয়ে থাকে।

সারণী- ৬.৭
জেলার সংক্ষিপ্ত কৃষিকথা

(ক) ভূমি ব্যবহার ঃ

১।	ভৌগোলিক আয়তন	-	৫,৩২,৫০০ হেক্টর
২।	চাষযোগ্য আবাদী জমি	-	৩,৬৫,০০০ হেক্টর
৩।	বনভূমি	-	৭৭১ হেক্টর
৪।	বাগিচা ফসলের এলাকা	-	১৬,৪৪৩ হেক্টর
৫।	(ক) চাষযোগ্য পতিত জমি	-	২,৫০০ হেক্টর
	(খ) অন্য পতিত জমি	-	১৫৫ হেক্টর
৬।	গোচারণ ক্ষেত্র	-	১,০১৪ হেক্টর
৭।	বাড়ীঘর, রাস্তাঘাট ইত্যাদির ব্যবহৃত জমি	-	১,৪৪,২৮৪ হেক্টর
৮।	(ক) নেট আবাদী জমি	-	৪,১৭,৯৯৭ হেক্টর
	(খ) মোট আবাদী জমি	-	৭,৯১,৬৯০ হেক্টর
৯।	চাষের নিবিড়তা	-	২১৭শতাংশ

(খ) লোক তথ্য ঃ

১।	জনসংখ্যা (২০০১)	-	৫৮,৬৩,৭১৭
২।	কৃষক	-	৬,৯৬,৭৬৭
৩।	ক্ষুদ্র কৃষক	-	৩,৩৬,৪২৩
৪।	প্রান্তিক কৃষক	-	১,৫১,৩১৪
৫।	কৃষি মজুর	-	৬,৬৭,০০৮

(গ) সেচ ঃ

১।	সেচপ্রাপ্ত জমির পরিমাণ	-	২,০১,৯৮৭ হেক্টর
২।	মোট আবাদী জমির পরিমাণ	-	৫৫.৩৩ শতাংশ

(ঘ) কৃষি পরিকাঠামো ঃ

১।	সরকারী বীজ খামার	-	২২ টি
	(ক) আদর্শ খামার	-	১টি
	(খ) মহকুমা উপযোগী গবেষণা খামার	-	৩টি
২।	ডালশস্য ও তৈলবীজ গবেষণা কেন্দ্র, বহরমপুর	-	১টি
	ডালশস্য ও তৈলবীজ উপ-গবেষণা কেন্দ্র, বেলডাঙ্গা	-	১টি
৩।	মাটি পরীক্ষাগার	-	১টি
৪।	সারের মান নিয়ন্ত্রণ পরীক্ষাগার	-	১টি
৫।	সার বিক্রয় কেন্দ্র	-	২৯৯২ টি
৬।	কীটনাশক বিক্রয় কেন্দ্র	-	৭০৫ টি
৭।	বীজ বিক্রয় কেন্দ্র	-	৬০৩ টি
৮।	হিম ঘর	-	৫ টি
৯।	প্রশিক্ষণ ও পরিদর্শন এলাকা	-	৩০৪ টি
১০।	হাট ও বাজার		
	(ক) সরকারী নিয়ন্ত্রিত বাজার	-	৪ টি
	(খ) মূল বাজার ও হাট	-	১৩৮ টি
	(গ) পাইকারী বাজার	-	২৭ টি
	মোট	-	**১৬৫ টি**
১১।	ফল সংরক্ষণ প্রতিষ্ঠান	-	১ টি
১২।	পাট বিক্রয় কেন্দ্র (জে. সি. আই)	-	১৯ টি

জেলার কৃষি জীবন

ভাগীরথী নদী এই জেলাকে দু'ভাগে ভাগ করেছে। পশ্চিম অংশ রাঢ় ও পূর্ব অংশ বাগড়ী নামে পরিচিত। পশ্চিমভাগ অপেক্ষাকৃত প্রাচীন, ভূমি উচ্চ, অসমতল, অনেক খাল বিল আছে। পূর্বাংশ সমতল ও উর্বর। ভূতত্ত্বে ও কৃষিতত্ত্বে উভয়াংশের মৃত্তিকা পৃথক। রাঢ়ের মাটির রং ঈষৎ হরিদ্রাভ, কোথাও বা লালবর্ণের (রাঙামাটি, কর্ণসুবর্ণ)। নদী তীরবর্তী কয়েক মাইল জুড়ে রয়েছে উর্বর ও সরস মাটি। স্থানীয় নাম 'রেতি' মাটি। এর পর থেকেই এলাকার মাটি শক্ত, উষর। সারা অঞ্চল জুড়ে ছোট বড় অসংখ্য নদ নদী দাঁড়ার জালিকা। ছোট বড় অনেক বিল ছড়িয়ে আছে এই অঞ্চলে। এখানে হৈমন্তিক বা আমন ধান বেশী জন্মায়। মুর্শিদাবাদ জেলার শস্য ভান্ডার বলতে এই রাঢ় অঞ্চলকেই বোঝানো হয়। বিস্তীর্ণ এলাকা দো-আঁশ মাটি দিয়ে গঠিত হলেও বিলের মাটি 'কালো মাটি' বলে পরিচিত। তার রং কালো, খুব উর্বর। বিলের

জমি বর্ষাকালে জলমগ্ন থাকে। অন্য ঋতুতে ধান চাষ হয়। কোন কোন এলাকা ময়ূরা(ী প্রকল্পের সেচ সেবিত হলেও নিয়মিত সেচের জল পাওয়া যায় না। অসেচ এলাকার পরিমাণও অনেকটা। ফলে চাষ এখানে প্রকৃতি নির্ভর।

এই অঞ্চলের মানুষকে কঠিন সংগ্রাম করেই ফসল ফলাতে হয়। জিরে, ধনে, কলোজিরে, প্রভৃতি মশলার চাষও এখন ব্যাপকভাবে হচ্ছে। রাঢ়ের নদীতে সহসা বন্যা এসে জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে তোলে। রাঢ়ের অর্থনৈতিক জীবন সুষম নয়। অসংখ্য নদীনালা থাকা সত্ত্বেও বৃষ্টিনির্ভর এই অঞ্চলের ছড়ায়, গানে, পল্লীবচনে শোনা যায় মেঘ ও আকাশের কাছে বৃষ্টির প্রার্থনার সুর। কৃষিভিত্তিক সমাজে নতুন শস্য ঘরে এলে অগ্রহায়ণ মাসে নবান্ন উৎসব হয়। এই মাস সে কারণে 'মার্গশীর্ষ' রূপে পরিচিত।

মাস মধ্যে মার্গশীর্ষ আপনি ভগবান,
হাটে মাঠে গৃহে গোঠে সবাকার ধান।

এখানকার ছড়ায়, লোকবচনে রাঢ় অঞ্চল যে কৃষি প্রধান তার পরিচয় ফুটে উঠেছে। তৈরী হয়েছে বীজ বপনের গান, ধান রোপণের গান, ধান ভানার গান।

বাগড়ী অঞ্চলের জমি নীচু, বর্ষার সময় জলমগ্ন থাকে, জমি উর্বরা। এখানে আশুধান (আউশ) ও আমন ধান, পাট, কলাই, গম, ও সব্জী বেশী জন্মায়। বাগড়ীর কোন কোন অএ(লের আলাদা স্থানীয় নাম আছে - ভড়, দিয়ার ও কালান্তর। বাগড়ী ত্র(মশ ঢালু হয়ে পদ্মাকে স্পর্শ করেছে। নরম মাটির এ সমস্ত এলাকায় জলঙ্গী, ভৈরব, পদ্মার খাত পরিবর্তনের চিহ্(হিসাবে ছড়িয়ে আছে বহু নিম্ন জলাভূমি। এর নাম ভড়এলাকা। নিচু জমিতে বছরে সহজেই দু'বার ধান হয় সব্জী ও মাছ হয় অফুরন্ত। তাই বাগড়ীতে প্রবাদ শোনা যায়, 'এক ভড় সাত রাঢ়ের সমান'। বাগড়ীর স্থান বিশেষ নদীতীরের উঁচু সমতল ভূমিকে দিয়াড় বলা হয়। যেমন জলঙ্গীতে সাদিখাঁর দিয়াড়, ডোমকলে পাড়দিয়ার, সাহাদিয়ার, কামুরদিয়ার। হরিহরপাড়ার সীমান্ত থেকে পলাশী পর্যন্ত বেলডাঙ্গা ও জলঙ্গী নদীর অন্তর্গত ভূখণ্ডের নিম্নভূমিতে জলনিকাশী ব্যবস্থার অভাবে বর্ষার চারমাস জল জমে সমুদ্রের রূপ নেয়। দ্বীপের মত জেগে থাকে গ্রাম, নৌকা হয় একমাত্র বাহন। এ অঞ্চলের মাটি এঁটেল, কালো । এই এলাকা কালান্তর নামে পরিচিত।

ভাগীরথী, ভৈরব, জলঙ্গী, পদ্মা বাগড়ীর প্রধান নদী। তাছাড়া আছে শিয়ালমারী, গোরানালা, ছোটভৈরব ইত্যাদি ছোট নদী খাত। আছে বিশাল ভাণ্ডারদহ ও আরো অনেক বিল। কৃত্রিম সেচের বন্দোবস্ত বাগড়ীতে ছিল না। সেচ ছিল প্রকৃতিনির্ভর। প্রথাগত প্রকৃতি নির্ভরতা এখনও থাকলেও আধুনিক বাগড়ীর কৃষি মুলত অগভীর নলকূপকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। বাগড়ীর সর্বত্র ভূস্তরের সামান্য নিচে আছে অফুরন্ত জল। কৃষক ব্যাঙ্ক-ঋণ নিয়ে বা নিজস্ব উদ্যোগে গড়ে তোলে অগভীর নলকূপের (ুদ্র সেচ প্রকল্পগুলি। বিগত শতাব্দীর ৬০ এর দশক পর্যন্ত বাগড়ী আউশ ধান, রবিশস্য ও সব্জীর চাষ, সর্বোপরী অর্থকরী ফসল পাটের জন্য বিখ্যাত ছিল। ঐ দশকের শেষ দিকে আধুনিক কৃষি পদ্ধতি, সঙ্কর বীজ, রাসায়নিক সার ও কীটনাশক, ব্যাঙ্ক ঋণ ও অনুদান, সরকারী নদী জলোত্তোলন ও গভীর নলকূপ ইত্যাদি সেচ প্রকল্পগুলি বাগড়ী র কৃষি উৎপাদনকে প্রভাবিত করতে থাকে। লালবাগ থেকে রেজিনগর পর্যন্ত ভূমিখন্ডেসামান্য জল ও সার পেলে সব্জী, গম, ধান, পাট, আখ - যে কোন ফসল বিপুল পরিমাণে ফলে। দীর্ঘকাল থেকে সারগাছি - বেলডাঙ্গা অঞ্চল নানা ধরণের সব্জী চাষের জন্য খ্যাত। বাগড়ীর সম্পন্ন কৃষক বিগত শতাব্দীর ৬০ দশকের পর থেকে সেচ, সার, কীটনাশক ব্যবহার করে বাগড়ীর কৃষি উৎপাদনের ধরণ পরিবর্তনে গু(ত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। পাটের বিঘা-প্রতি ফলন অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে । গম উৎপাদন গু(ত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে । সঙ্কর ধান বীজ বছরে দু'বার ধানচাষের সুযোগ এনে দিয়েছে। আগে পাট ছিল এক মাত্র অর্থকরী ফসল। কৃত্রিম তন্তুর প্রসারের পরিণামে পাট শিল্পে মন্দা হেতু পাটের দাম কমে গেছে। তবু পাটের বিকল্প ফসল নেই, পাট কেটেই বর্ষার ধান লাগনো যায়, জ্বালানী হিসাবে ও বেড়া দিতে পাট কাঠি অপরিহার্য, পাটকাঠি এখন বাণিজ্য পণ্যও বটে - এসব কারণে পাটের চাষ তেমন কমেনি। অন্যদিকে পেঁপে, কলা, পান, সব্জী তৈলবীজ ত্র(মশ গু(ত্বপূর্ণ অর্থকরী ফসল হয়ে উঠছে ।

বাজারের চাহিদা কৃষি উৎপাদনে বেশ প্রভাব ফেলেছে। কৃষক বাজারের চাহিদা ও লাভের কথা মাথায় রেখে কৃষিপণ্য উৎপাদনের সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু এখনো সারা বছরের পারিবারিক প্রয়োজনই বাগড়ীর কৃষি উৎপাদনের অন্যতম নিয়ামক। মোট কৃষি(ে ত্রের এক অংশে বাজারের জন্য ফসল উৎপাদন এবং জমির অন্য অংশে পারিবারিক প্রয়োজনে ফসল উৎপাদন - এই দ্বৈত রীতি বাগড়ীতে দৃশ্যমান। চাষের জমির এলাকা বেড়েছে। বিল জলার জমিতে সামান্য জল ও সার দিয়ে ব্যাপক ভাবে খরার ধান চাষ হচ্ছে। ফলের বাগানের সংখ্যা দ্রুত কমছে তার জায়গা নিচ্ছে চাষের জমি।

জেলাতে উন্নত শিল্প কেন্দ্র নেই, ফলে জনসংখ্যার বৃহত্তর অংশ মূলতঃ কৃষি নির্ভর । ময়ূরা(ী নদীর সেচ- পরিকল্পনা, সেচ ব্যবস্থায় বিদ্যুতের ব্যাপক প্রচলন, গভীর ও অগভীর নলকূপের ব্যাপক ব্যবস্থা, নলকূপ থেকে এবং নদী - নালা - বিল থেকে ব্যাপক জল উত্তোলন ব্যবস্থার জন্য সাম্প্রতিকালে কৃষি(ে ত্রে ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে। কৃষি বিভাগ ও সমষ্টি উন্নয়ন বিভাগের সম্প্রসারণ কর্মীবৃন্দ, সমবায়ে কৃষি ঋণ সমিতির সহায়তা কারিগরী কর্মীবৃন্দ ও অগ্রণী সচেতন কৃষকদের সমবেত প্রয়াসে কৃষি (ে ত্রে বিপুল সাফল্য

পরিলি(ত হলেও, জনসংখ্যার ত্র(মবর্দ্ধমান উর্ধগতির দ(ণ তার ফল দরিদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মধ্যে তেমনভাবে পৌঁছতে পারেনি। স্মল ফার্মারস ডেভেলপমেন্ট এজেন্ট এস.এফ্.ডি. এ. ১৯৭৫ থেকে বিভিন্ন উন্নয়নের কাজে ব্রতী হয় কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের উদ্যোগে। ১৯৮০ সালের পর থেকে জেলা গ্রামীণ উন্নয়ন সংস্থা কৃষি ও গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নের সার্বিক প্রয়াস চালান। ব্লক পর্যায়ে বিভিন্ন সরকারী বিভাগ, ব্যাঙ্ক সমবায়, পঞ্চায়েত মিলে প্রান্তিক ও দরিদ্র চাষীদের সার্বিক উন্নয়নের প্রয়াস চালানো হয়। বর্তমান ভূমি ব্যবস্থা ও আর্থিক কাঠামোর মধ্যেও এই উদ্যোগ কৃষি(ত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে।

উন্নত জাতের ধান, চাল, গম, আখ, পাট, ডাল, তৈলবীজ, আলুর ব্যাপক প্রচলন, মাটি পরী(ার ব্যবস্থা, রোগ, কীটনাশক ওষুধের এবং রাসায়নিক সারের ব্যাপক প্রয়োগ, কৃষিকাজে আর্থিক অনুদান ও ঋণদানের ব্যবস্থা, উন্নত জাতের বীজ সরবরাহ, কৃষি-প্রযুক্তি(র প্রচার ও প্রসার, বিপণন ও বাজারের সুযোগ কৃষি(ত্রে আমূল পরিবর্তন এনে দিয়েছে। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে সেই সঙ্গে চালানও বেড়েছে। সাধারণ মানুষের খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তিতহয়েছে। বিগত তিন দশকে রাঢ় ও বাগড়ী অঞ্চলে কৃষি পদ্ধতির নানা পরিবর্তন, রূপান্তর ঘটেছে। কয়েকটি ভয়াবহ বন্যায় ও নানা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ব্যাপক ফসলহানি ঘটেছে। তবু স্বীকার করতে হয় উন্নত কৃষি ব্যবস্থার আনুপাতিক ফল দুঃস্থ ও দরিদ্র শ্রেণীর কাছেও দুর্বলতর শ্রেণীর মধ্যে আশানুরূপ পৌঁছতে পারেনি। কৃষি - শ্রমিকেরা অনেক (ত্রে উপযুক্ত(মজুরী পান না। বেনামী জমির কিছু মালিক কৃষি উন্নয়নের সিংহভাগ ভোগ করেন। গ্রামীণ মহাজন, জোতদার ও উঠতি ব্যবসায়ী শ্রেণী গ্রামীণ অর্থনীতির (ত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা এখনো বজায় রেখেছেন। ব্যাঙ্ক সমবায়, সরকারী নানা উদ্যোগ তাদের প্রভাবকে অনেকখানি খর্ব করলেও কৃষি(ত্রে নানা শোষণ ও অব্যবস্থা বজায় আছে। আলু ও অন্যান্য কৃষিপণ্যের মূল্য নির্ধারণ করেন একশ্রেণীর ব্যবসায়ী শ্রেণী। ফলে সাধারণ কৃষকেরা আলুর ন্যায্য দাম অনেক সময় পান না। সম্প্রতি সমবায় পদ্ধতিতে হিমঘর এর মাধ্যমে এই শোষণ থেকে রেহাই দেবার চেষ্টা চলছে। কৃষিজাত পণ্যের মূল্যের সঙ্গে বৃহৎ মালিক গোষ্ঠীর উৎপাদিত নানা শিল্পজাত দ্রব্যাদির বাজার মূল্যের কোন সঙ্গতি না থাকায় কৃষকেরা আর্থিক দিক থেকে নানা ভাবে মার খাচ্ছেন। সরকারী প্রয়াস অব্যাহত থাকলেও এ (ত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসেনি।

হাজার হাজার বছর ধরে কৃষিকে কেন্দ্র করেই সমস্ত উৎসব পাল-পার্বনের প্রচলন হয়েছে। দুর্গাপূজা (নবপত্রিকা উল্লেখ্য), লক্ষ্মী, নবান্ন, ভাদু, (ত্রপাল, পৌষ পার্বন, করম, বাধনা, মেলেনী মাসির ব্রত, যম পুকুর ব্রত, সাজ পুজুনি ব্রত এসবের মূলে আছে কৃষি। এমনকি পশুবলি দিয়ে মাটিতে রক্ত(ছিটানোর পেছনেও কৃষি উৎপাদনের ধারণা (Fertility Cult) কাজ করে থাকে। নানা ব্রতকথা, লোক কথা, ছড়া ও লৌকিক গানে কৃষির নানা পদ্ধতিতে, কৃষি প্রয়াস ও উপকরণ মিশে আছে। ধান, যব, ছোলা, মটর প্রভৃতি এই প্রান্তে প্রচলিত ব্রতকথায় বার বার এসেছে।

ধান এল ছালা ছালা
তা তুলতে গেল বেলা
গম এল ছালা ছালা
তা তুলতে গেল বেলা
ছোলা এল ছালা ছালা
তা তুলতে গেল বেলা।

সামাজিক ও ধর্মীয় নানা অনুষ্ঠানে ধান্য, দুর্বা, আতপ, তিল, যব, সরিষা, মাসকলাই, ছোলা, মসুরী, বেগুন, শিম, কলা, আতপ, পান, সুপারী, হলুদ প্রভৃতি একান্ত দরকার হয়। ধানের গোলা দিয়ে আলপনা দেওয়া হয় নানা মাঙ্গলিক কাজে গৃহাঙ্গণে। মুঠি সংত্র(ান্তি, গর্ভ সংত্র(ান্তি, ভাজো এসব অনুষ্ঠানের সঙ্গে এদেশের কৃষি ব্যবস্থার প্রাচীন পদ্ধতি একান্ত ভাবে সং(-ষ্ট। বীজ পরী(া, ফসলের উৎপাদন, পরিচর্যা এসবের সঙ্গে এই প্রচলিত অনুষ্ঠানের নিবিড় সংযোগ আছে। ধান আমাদের প্রধান খাদ্য। তাই ধান লক্ষ্মী। ভাদ্র, পৌষ, চৈত্র মাসে গৃহস্থরা ধান দিয়ে গৃহকোণে লক্ষ্মী পূজা করেন। বোলান পাঁচালী, সঙ, হাবু, কবি ইত্যাদি গানে বর্তমান কৃষি পদ্ধতির নানা অন্তরঙ্গ চিত্র আঁকা থাকে। কুমারী ব্রতর মধ্য দিয়ে কৃষির সঙ্গে একান্ত হবার প্রয়াস দেখা যায়। লাঙ্গল, বলদ, দোন, কোদাল, সংস্কৃতির বিষয়ীভূত হয়েছে। আখ ও চালকুমড়ো বলিদান, শ্রীপঞ্চমীর পরদিন কলাইসিদ্ধ খাওয়া, নবান্ন, পঞ্চশস্য, বিশেষ তিথিতে অলাবু ভ(ণ না করা, করলা না খাওয়া , তিথি নির্বাচন করে নতুন শাকসব্জী খাওয়া, জ্যৈষ্ঠ সংত্র(ান্তিতে কেলেকুড়া ভ(ণ, আমড়া মনসা- পঞ্চমীর পর ভ(j, নবান্নের আগে নতুন ধান খাওয়া নিষেধ, এসব অনুষ্ঠান ও অনুশাসন ধর্মীয় ও সামাজিক দিক থেকে এলেও মূলত কৃষিকেন্দ্রিক। অম্বুবাচিতে হলকর্ষণ নিষিদ্ধ, নবান্নে মূলো-মাছ খাওয়া বিধেয় এসব অসংখ্য নিয়ম কানুন আমাদের নিজস্ব কৃষি পদ্ধতির স্মারক মাত্র। কৃষিকেন্দ্রিক নানা অনুষ্ঠানে, সংস্কার, ধ্যান ধারণা আমাদের সমাজকে নানাভাবে বেঁধে রেখেছে।

জেলার প্রধান ফসলের চাষ ও উৎপাদন

জেলার তণ্ডুলজাতীয় ফসলগুলির মধ্যে অন্যতম ধান ও গম। এছাড়া অন্যান্য প্রধান ফসলগুলির মধ্যে রয়েছে ডালশস্য, তৈলবীজ, পাট, সব্জী ও আলু।

তণ্ডুলজাতীয় ফসলের মধ্যে ধান চাষের এলাকা ত্র(মশই বাড়ছে। অপরদিকে ডালশস্যের এলাকা আশির দশকের তুলনায় এই সহস্রাব্দে. কমে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৫০ শতাংশ। কারণ সেচের এলাকার সম্প্রসারণ জনিত কারণে কম মুনাফার ডালশস্য চাষে কৃষকদের অনীহা। কিন্তু তৈলবীজ, পাট, আলু এবং বিশেষ করে সব্জী চাষের এলাকা ত্র(মাগত বাড়ছে যার জন্য চাষের নিবিড়তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২১৭ শতাংশে। অবশ্য বিগত ২/৩ বছর থেকে আবহাওয়ার সুস্পষ্ট পরিবর্তনের ফলে ফসল চাষে ও উৎপাদনে প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি হয় যার জন্য বিশেষ করে তৈলবীজের এলাকা একই রকম বা ৯০ দশকের তুলনায় প্রায় ১৫-২০ শতাংশ কমে গেছে।

সারণী- ৬.৮ এ জেলায় উৎপন্ন হয় এমন ৬টি তণ্ডুলজাতীয় শস্য, ডালশস্য, তৈলবীজ, পাট ও সব্জী চাষের এলাকা ও উৎপাদনের কমা-বাড়া সম্পর্কে ধারণা দেবে।

এই পরিসংখ্যান থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, তণ্ডুলজাতীয় দানাশস্যের এলাকা গত দুই দশকে প্রায় ৩০৯ শতাংশ বেড়েছে। এর পাশাপাশি এটাও ঠিক যে মোট চাষের জমির এলাকা আশির দশকে ছিল ৩,৯৫,০০০ হেক্টর। কিন্তু নব্বই দশক থেকে পদ্মানদীর ভাঙণের জন্য এবং আরও অন্যান্য কারণে এখন মোট চাষের জমির এলাকা ধরা হয়েছে ৩,৬৫,০০০ হেক্টর। কিন্তু তা সত্ত্বেও মূলতঃ দুটি কারণে তণ্ডুলজাতীয় ফসলের মধ্যে ধান চাষের এলাকা বেড়ে চলেছে ---

(১) খরিফ মরশুমে বৃষ্টিপাত স্বাভাবিক হলে পাট কেটে আমন ধান চাষের এলাকা বাড়ছে। (২) বোরো ধানের চাষের এলাকা উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে। তণ্ডুলজাতীয় দানাশস্যের মোট উৎপাদনও ১৯৮০-৮১ সালে ছিল ৬২০.৫৬৩ হাজার মেঃ টন যা ১৯৯৯ - ২০০০ সালে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১২০৭.৬৮৬ হাজার মেঃ টন।

এই ভাবে তণ্ডুলজাতীয় দানাশস্যের মোট উৎপাদন আশাতীত বেড়েছে। আবার ধানের মোট উৎপাদন ত্র(মশই বাড়ার পিছনে রয়েছে দুটি কারণ ঃ (১) খরিফ মরশুমে উচ্চ ফলনশীল ধান চাষের এলাকা উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে।

সারণী - ৬.৮

কৃষি এলাকা ও উৎপাদনের পরিবর্তন

(হাজার হেক্টর ও মেট্রিক টন)

ফসল	১৯৮০-৮১		১৯৮৫-৮৬		১৯৯০-৯১	
	এলাকা	উৎপাদন	এলাকা	উৎপাদন	এলাকা	উৎপাদন
তণ্ডুল জাতীয় দানা শস্য	৪২৫.৪২৯	৬২০.৫৬৩	৩৪৩.৭৪৪	৬৯৫.৮৮৮	৪৩০.৮৩৫	৯৬৪.৬৫৮
ডাল শস্য	১০৩.২৫৩	৭২.১৭৮	৯৯.৫৪৩	৭৪.৮৪৯	৮৬.৪০৬	৫১.৪৯১
তৈলবীজ	৩২.৯০৫	২৮.৩১০	৬৭.১৭৬	৫১.২৬০	৮৯.৬৯৩	৮৬.৩৩০
পাট	১৪১.৬৬৯	৬৮৪.০৯৪	১০৮.২২৯	-		
সব্জী	১২.০০	১২০.০০	৩২.০৬৫	৪৮৬.৮৫৫	৮৭.২০৫	৬১০.৯৭৮
আলু	৮.৬০৮	৯০.৩৮৯	৭.৯৫৫	১২১.৫১৯	১০৫১৫	১৯৩.৮০৯

ফসল	১৯৯৫ - ৯৬		১৯৯৯-২০০০	
	এলাকা	উৎপাদন	এলাকা	উৎপাদন
তণ্ডুল জাতীয় দানা শস্য	৪৪৮.১৪০	১১০৭.৩৩৪	৪৬৬.৬৭৯	১২০৭.৬৮৬
ডাল শস্য	৬৯.৪৪৫	৪৭.৪৭৫	৪৪.৪৭৫	৩৬.৮৬০
তৈলবীজ	৮৮.৯৩০	৮২.৭৯৫	৭৭.৪৪০	৭৪.২৯২
পাট			৯১.৬০৫	১২৩৬.৬৬৭
সব্জী	৫৭.৭২৭	৯০৯.৫৬৬	৬২.৯০৯	১০১০.২৫৯
আলু	১৩.২৪৮	২৯০.৮১০	১৫.২২৪	৩০০.০১০

সূত্র ঃ মুখ্য কৃষি আধিকারিক, মুর্শিদাবাদ

সারণী - ৬.৯

খরিফ মরশুমে উচ্চ ফলনশীল ধান চাষের অগ্রগতি

বছর	মোট ধান চাষের এলাকা (হেক্টরে)	শতাংশ	উচ্চ ফলনশীন ধান চাষের এলাকা (হেক্টরে)	দেশী ধান চাষের এলাকা (হেক্টরে)
১৯৮০ - ১৯৮১	১,৮৬,৩৪০	৩৩.৭২%	৬২,৬৩৬	১,২৩,৫০৪
১৯৮৫ - ১৯৮৬	১,৬২,১০৫	২৯.১৪%	৪৭,২৪০	১,১৪,৮৬৫
১৯৯০ - ১৯৯১	১,৯৯,৮৩৯	৫৭.১২%	১,১৪,১৬৪	৮৫,৬৭৫
১৯৯৫ - ১৯৯৬	২,১৩,৯০৭	৭১.২৩%	১,৫২,৩৭৭	৬১,৫৩০
১৯৯৯ - ২০০০	২,২৩,৭০৫	৮২.৪০%	১,৮৪,৩৫৩	৩৯,৩৫২

সূত্র ঃ মুখ্য কৃষি আধিকারিক, মুর্শিদাবাদ

ডাল শস্যের (ে ত্রে চাষের এলাকা অর্ধেকরও বেশী কমেছে। কারণ (১) এই চাষ তুলনামূলকভাবে কম লাভজনক, (২) সেচসেবিত এলাকা বাড়ছে এবং সেখানে অন্য ফসলের চাষ হচ্ছে, (৩) মিশ্র চাষ এবং পয়রা ফসলের এলাকা কমে যাচ্ছে।

তৈলবীজের (ে ত্রে চাষের এলাকা ও ফলনের হার ৮০-৮১ সালের তুলনায় আশাতীত হারে বেড়েছে। এর পিছনে রয়েছে - (১) তৈলবীজের চাহিদা (২) উন্নত বীজের ব্যবহার এবং সুষম সারের প্রয়োগ এবং প্রয়োজনে ঔষধ প্রয়োগে রোগ- পোকা দমন।

প্রসঙ্গত ঃ বলা যায়, পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে একমাত্র বহরমপুরে রয়েছে ডালশস্য ও তৈলবীজের গবেষণা কেন্দ্র। যেখান থেকে ডালশস্য ও তৈলবীজের উন্নতমানের বীজের উদ্ভাবন সম্ভব হচ্ছে এবং কৃষি (ে ত্রে ব্যবহার করে মোট উৎপাদন বাড়ছে।

পাট একটি বাণিজ্যিক ফসল এবং জেলার প্রধান ফসলগুলির মধ্যে অন্যতম। আশির দশকের তুলনায় বর্তমানে পাট চাষের এলাকা প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। কিন্তু জেলার পাট চাষীগণ চাষ করে উপকৃত হচ্ছেন না। তবু কৃষকগণ পাট চাষ করেছেন, কারণ এই চাষে কতকগুলি বিশেষ সুবিধা আছে, তাছাড়াও পাটকাঠি জ্বালানী এবং অন্য জ(রি কাজে ব্যবহৃত হয়।

এ প্রসঙ্গে বলে রাখা যায় যে, বহরমপুর ও লালবাগ মহকুমায় ১২টি ব্লকে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে বিশেষ পাট উন্নয়ন প্রকল্প চালু আছে যাতে পাটের উৎপাদনের হার বৃদ্ধি এবং উন্নতমানের পাট উৎপাদন সম্ভব হয়।

সব্জী জেলার একটি প্রধান অর্থকরী ফসল। কৃষকেরা বছরে ৩টি মরশুমে সব্জী চাষ করে থাকেন। আশির দশকের তুলনায় এখন সব্জী চাষের এলাকা প্রায় ৪ গুণ বেড়েছে। তাছাড়াও আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি(র প্রবর্তনে বেড়েছে উৎপাদনের হার। তাই প্রচুর পরিমাণে উদ্বৃত্ত শাক-সব্জী জেলার বাইরে চালান দিয়ে কৃষকদের আর্থিক সচ্ছলতা আসছে। বর্তমানে সব্জী চাষে সঙ্কর বীজের প্রবর্তনে চাষের এলাকা এবং উৎপাদনের হার আগের তুলনায় অনেক বেড়েছে।

যদিও আলু জেলার প্রধান ফসল বলে চিহ্নি(ত হয়নি, তবুও আলু চাষের এলাকা উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে। আশির দশকের তুলনায় বর্তমানে আলু চাষের এলাকা এবং উৎপাদনের হার প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে।

খাদ্যশস্যের চাহিদা ও উৎপাদন ঃ জেলার ২০০০ সালের জনসংখ্যার উপর ভিত্তি করে তণ্ডুলজাতীয় দানাশস্য, ডালশস্য, তৈলবীজ ও সব্জীর বাৎসরিক চাহিদা এবং পাশাপাশি ১৯৯৯ সালে উৎপাদনের পরিসংখ্যান দিয়ে জেলার বর্তমান চিত্রটা তুলে ধরা হ'ল (১) ২০০১ সালে জেলার জনসংখ্যা- ৫৮.৬৪ ল(।

সারণী - ৬.১০

১৯৯৯ সালে ফসলের উৎপাদন এবং খাদ্যশস্যের চাহিদার পরিসংখ্যান

ফসল	খাদ্যশস্যের চাহিদা	ফসলের উৎপাদন	উদ্বৃত্ত / ঘাটতি	মন্তব্য
তণ্ডুলজাতীয় দানা শস্য	৯৩৪.২৫৪	১২০৭.৬৮	উদ্বৃত্ত	গড়ে ৪৫০ গ্রাম মাথাপিছু (প্রতিদিন)
ডালশস্য	৬২.২৮৩	৩৬.৮৬	৪১ শতাংশ ঘাটতি	গড়ে ৩০ গ্রাম মাথাপিছু (প্রতিদিন)
তৈলবীজ	১০৮.০৭২	৭৪.২৯২	৩১ শতাংশ ঘাটতি	গড়ে ১৯ কেজি মাথাপিছু (প্রতিদিন)
সব্জী	৫১৮.৩১৪	১০১০.২৫৯	উদ্বৃত্ত	গড়ে ২৮০ গ্রাম মাথাপিছু (প্রতিদিন)

সূত্র ঃ মুখ্য কৃষি আধিকারিক, মুর্শিদাবাদ